أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 110) www.motaher21.net

وَأَوْفُوا بِعَهْدِىَ

"তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো।"

" Fulfil your obligations."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৪০

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْۚ وَ اِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ

হে বনী ইসরাঈল। আমার সেই নিয়ামতের কথা মনে করো, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম, আমার সাথে তোমাদের যে অঙ্গীকার ছিল, তা পূর্ণ করো, তা হলে তোমাদের সাথে আমার যে অঙ্গীকার ছিল, তা আমি পূর্ণ করবো এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো।

৪০ নং আয়াতের তাফসীর:

এ সূরার চল্লিশতম আয়াত থেকে আরম্ভ করে একশত তেইশতম আয়াত পর্যন্ত শুধু আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাসী আহলে-কিতাবদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। সেখানে তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমে তাদের

বংশগত কৌলিন্য, বিশ্বের বুকে তাদের যশ-খ্যাতি, মান-মর্যাদা এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত অনুকম্পাধারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের পদচ্যুতি ও দুস্কৃতির জন্য সাবধান করে দেয়া হয়েছে এবং সঠিক পথের দিকে আহবান করা হয়েছে। প্রথম সাত আয়াতে এসব বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে প্রথম তিন আয়াতে ঈমানের দাওয়াত এবং চার আয়াতে সৎকাজের শিক্ষা ও প্রেরণা রয়েছে। এরপর অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বিস্তারিত সম্বোধনের সূচনাপর্বে গুরুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে (হে ইসরাঈলের বংশধর) শব্দসমষ্টি দ্বারা সংক্ষিপ্ত সম্বোধনের সূচনা হয়েছিল, সমাপ্তি পর্বেও সেগুলোরই পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

বনী ইসরাঈলকে যে সমস্ত নে'আমত প্রদান করা হয়েছে তা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, ফেরআউন থেকে নাজাত, সমুদ্রে রাস্তার ব্যবস্থা করে তাদের বের করে আনা, তীহ ময়দানে মেঘ দিয়ে ছায়া প্রদান, মান্না ও সালওয়া নাযিলকরণ, সুমিষ্ট পানির ব্যবস্থা করণ ইত্যাদি। তাছাড়া তাদের হিদায়াতের জন্য অগণিত অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ ও তৎকালীন বিশ্বের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানও উল্লেখযোগ্য।

এ আয়াতে ইসরাঈল-বংশধরগণকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ "আর তোমরা আমার অংগীকার পূরণ কর"। অর্থাৎ তোমরা আমার সাথে যে অংগীকার করেছিলে, তা পূরণ কর। কাতাদাহ-এর মতে তাওরাতে বর্ণিত সে অংগীকারের কথাই কুরআনের এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ইসরাঈল-বংশধর থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা তাদের মাঝে থেকে বার জনকে দলপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলাম"। [সূরা আল-মায়েদাহঃ ১২]

সমস্ত রাসূলের উপর ঈমান আনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংগীকারই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাদের মধ্যে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এছাড়া সালাত, যাকাত এবং মৌলিক ইবাদতও এ অংগীকারভূক্ত। এ জন্যই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন যে, এ অংগীকারের মূল অর্থ মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণ অনুসরণ।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অংগীকার ও চুক্তির শর্তাবলী পালন করা অবশ্য কর্তব্য আর তা লংঘন করা হারাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, অংগীকার ভংগকারীদেরকে নির্ধারিত শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে এই শাস্তি দেয়া হবে যে, হাশরের ময়দানে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবজাতি সমবেত হবে, তখন অংগীকার ভংগকারীদের পিছনে নিদর্শনস্বরূপ একটি পতাকা উত্তোলন করে দেয়া হবে এবং যত বড় অংগীকার ভংগ করবে, পতাকাও তত উচু ও বড় হবে। [সহীহ মুসলিম: ১৭৩৮] এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে লজ্জিত ও অপমানিত করা হবে।

‘ইসরাঈল’ শব্দের অর্থ হচ্ছে আবদুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা। এটি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উপাধি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি এ উপাধিটি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের পুত্র ও ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রপুত্র। তাঁরই বংশধরকে বলা হয় বনী ইসরাঈল। আগের চারটি রুকূ’তে যে ভাষণ পেশ করা হয়েছে তা একটি ভূমিকামূলক ভাষণ। এই ভাষণে সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এখন এই পঞ্চম রুকূ’ থেকে চৌদ্দ রুকু’ পর্যন্ত যে ভাষণ চলছে, এটি একটি ধারাবাহিক ভাষণ। এই ভাষণে মূলত বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হয়েছে। তবে মাঝে মধ্যে কোথাও কোথাও খৃস্টান ও আরবের মুশ্রিকদের দিকে লক্ষ্য করেও কথা বলা হয়েছে। আবার সুবিধা মতো কোথাও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা ইসলামের ওপর ঈমান এনেছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। এ ভাষণটি পড়ার সময় নিম্নোক্ত কথাগুলো বিশেষভাবে সামনে রাখতে হবেঃ

একঃ পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাতের মধ্যে এখনো কিছু সংখ্যক সত্যনিষ্ঠ এবং সৎবৃত্তি ও সদিচ্ছা সম্পন্ন লোক রয়ে গেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সত্যের আহবায়ক এবং যে আন্দোলনের মহানায়ক করে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার এবং তাঁর আন্দোলনে শরীক হবার জন্য আহবান জানানোই এ ভাষণের উদ্দেশ্য। তাই তাদের বলা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তোমাদের নবীগণ এবং তোমাদের কাছে আগত সহীফাগুলো যে দাওয়াত ও আন্দোলন নিয়ে বার বার এসেছিল এই কুরআন ও এই নবী সেই একই দাওয়াত ও আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। প্রথমে এটি তোমাদেরকেই দেয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা নিজেরা এ পথে চলবে এবং অন্যদেরকেও এদিকে আহবান জানাবে এবং এ পথে চালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু অন্যদেরকে পথ দেখানো তো দূরের কথা তোমরা নিজেরাই সে পথে চলছো না। তোমরা বিকৃতির পথেই এগিয়ে চলছো। তোমাদের ইতিহাস এবং তোমাদের জাতির বর্তমান নৈতিক ও দ্বীনি অবস্থাই তোমাদের বিকৃতির সাক্ষ্য দিয়ে চলছে। এখন আল্লাহ সেই একই জিনিস দিয়ে তাঁর এক বান্দাকে পাঠিয়েছেন এটি কোন নতুন ও অজানা জিনিস নয়। তোমাদের নিজেদের জিনিস। কাজেই জেনে-বুঝে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করো না। বরং তাকে মেনে নাও। যে কাজ তোমাদের করার ছিল কিন্তু তোমরা করোনি। সেই কাজ আজ অন্যেরা করার জন্য এগিয়ে এসেছে। তোমরা তাদের সাথে সহযোগিতা করো।

দুইঃ সাধারণ ইহুদিদের কাছে চূড়ান্ত কথা বলে দেয়া এবং তাদের দ্বীনি ও নৈতিক অবস্থাকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্যে। তোমাদের নবীগণ যে দ্বীনের পতাকাবাহী ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সে দ্বীনেরই দাওয়াত দিচ্ছেন – একথাটিই তাদের সামনে প্রমাণ করা হয়েছে। দ্বীনের মূলনীতির মধ্যে এমন একটি বিষয়ও নেই যেখানে কুরআনের শিক্ষা তাওরাতের শিক্ষা থেকে আলাদা-একথাই তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল তার আনুগত্য করার এবং নেতৃত্বের যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল তার হক আদায় করার ব্যাপারে তোমরা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছো। এমন সব ঘটনাবলী থেকে এর সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যার প্রতিবাদ করা তাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। আবার সত্যকে জানার পরও যেভাবে তারা তার বিরোধিতায় চক্রান্ত, বিভ্রান্তি সৃষ্টি, হঠধর্মিতা, কূটতর্ক ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছিল এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনকে সফলকাম হতে না দেয়ার জন্য যেমন পদ্ধতি অবলম্বন করছিল তা সবই ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। এ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাদের বাহ্যিক ধার্মিকতা নিছক একটি ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠার পরিবর্তে হঠধর্মিতা, অজ্ঞতা মূর্খতাপ্রসূত বিদ্বেষ ও স্বার্থান্ধতা। আসলে সৎকর্মশীলতার কোন কাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি তারা চায় না।

এভাবে চূড়ান্ত কথা বলে দেয়ায় যে সুফল হয়েছে তা হচ্ছে এই যে একদিকে ঐ জাতির মধ্যে যেসব সৎলোক ছিল তাদের চোখ খুলে গেছে এবং অন্যদিকে মদীনার জনগণের বিশেষ করে আরব দেশের মুশরিকদের ওপর তাদের যে ধর্মীয় ও নৈতিক প্রভাব ছিল, তা খতম হয়ে গেছে। তৃতীয়ত নিজেদের আবরণহীন চেহারা দেখে তারা নিজেরাই হিম্মতহারা হয়ে গেছে। ফলে নিজের সত্যপন্থী হবার ব্যাপারে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ রূপে নিশ্চিত সে যেমন সৎসাহস ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলায় এগিয়ে আসে তেমনটি করা তাদের পক্ষে কোন দিন সম্ভব হয়নি।

তিনঃ আগের চারটি রুকূ'তে সমগ্র মানবজাতিকে সাধারণভাবে দাওয়াত দিয়ে যেসব কথা বলা হয়েছিল সে একই প্রসঙ্গে যে জাতি আল্লাহ প্রেরিত বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তেমনি একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত দিয়ে তার পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে বক্তব্য সুস্পষ্ট করার জন্য বনী ইসরাঈলকে বাছাই করার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। পৃথিবীর অসংখ্য জাতিদের মধ্যে বর্তমান বিশ্বে একমাত্র বনী ইসরাঈলই ক্রমাগত চার হাজার বছর থেকে সমগ্র মানবজাতির সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে বেঁচে আছে। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করার পথে কোন জাতির জীবনে যত চড়াই উতরাই আসতে পারে তার সবগুলোরই সন্ধান পাই আমরা এ জাতিটির মর্মান্তিক ইতিকথায়।

চারঃ মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের শিক্ষা দেয়াই এর উদ্দেশ্য। পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাতরা অধঃপতনের যে গভীর গর্তে পড়ে গিয়েছিল তা থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে রক্ষা করাই এর লক্ষ্য। ইহুদিদের নৈতিক দুর্বলতা, ধর্মীয় বিভ্রান্তি এবং বিশ্বাস ও কর্মের গলদগুলোর মধ্য থেকে প্রতিটির দিকে অংগুলি নির্দেশ করে তার মোকাবিলায় আল্লাহর সত্য দ্বীনের দাবীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে মুসলমানরা পরিষ্কারভাবে নিজেদের পথ দেখে নিতে পারবে এবং ভুল পথ থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবে।

এ প্রসঙ্গে ইহুদি ও খৃস্টানদের সমালোচনা করে কুরআন যা কিছু বলেছে সেগুলো পড়ার সময় মুসলমানদের অবশ্যি নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বিখ্যাত হাদীস মনে রাখা উচিত। হাদীসটিতে তিনি বলেছেনঃ তোমরাও অবশেষে পূর্ববর্তী উম্মাতদের কর্মনীতির অনুসরণ করবেই। এমন কি তারা যদি কোন গো-সাপের গর্তে ঢুকে থাকে, তাহলে তোমরাও তার মধ্যে ঢুকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইহুদি ও খৃস্টানদের কথা বলছেন? জবাব দিলেন, তাছাড়া আর কি? নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি কেবলমাত্র একটি ভীতি প্রদর্শনই ছিল না বরং আলাহ প্রদত্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছিলেন, বিভিন্ন নবীর উম্মাতের মধ্যে বিকৃতি এসেছিল কোন্ কোন্ পথে এবং কোন্ আকৃতিতে তার প্রকাশ ঘটেছিল।

বানী ইসরাঈলকে ইসলামের দিকে আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে ইসলাম কবূল করতে আদেশ করেছেন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অনুসরণ করতে বলেছেন। বানী ইসরাঈলদের নবী ইয়া'কূব (আঃ)-এর বানী স্মরণ

করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যিনি তার অনুসারীদেরকে বলেছিলেনঃ ওহে ধর্মভীরুগণ যারা মহান আল্লাহকে মান্য করছো! তোমরা তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের মত সত্য ধর্মকে অনুসরণ করো। যেমন বলা হয়ে থাকেঃ হে অমুক ধার্মিক ব্যক্তির সন্তান! এটা করো অথবা উহা করো, অথবা হে সাহসী ব্যক্তির সন্তান! জিহাদে অংশ নিয়ে জীবন-পণ যুদ্ধ করো, অথবা হে অমুক জ্ঞানী ব্যক্তির সন্তান! জ্ঞানের অন্বেষন করো। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ١ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا﴾

তোমরাই তো তাদের বংশধর যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, সে তো ছিলো পরম কৃতজ্ঞ দাস। (১৭ নং সূরাহ্ ইসরাহ, আয়াত নং ৩)

ইয়া'কূব (আঃ)-এর নাম ছিলো ইসরাঈল

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমরা কি জান যে, ইয়া'কূব (আঃ)-এর অপর নাম ছিলো ইসরাঈল? তারা বললোঃ মহান আল্লাহ স্বাক্ষী! (তায়ালেসী ৩৫৬) অবশ্যই আমরা জানি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে মহান আল্লাহ! তুমি স্বাক্ষী থাকো। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, ইসরাঈল অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহর দাস বা বান্দা। (তাফসীর তাবারী ১/৫৫৩)

বানী ইসরাঈলকে অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

বানী ইসরাঈলদেরকে ঐ সব অনুগ্রহের কথা স্মরণ করানো হচ্ছে যা ব্যাপক ক্ষমতার বড় বড় নিদর্শন ছিলো। যেমন পাথর হতে ঝর্ণা বা নদী প্রবাহিত করা, 'মান্না' ও 'সালাওয়া' অবতরণ করা, ফির'আউনের দলবল হতে রক্ষা করা। (তাফসীর তাবারী ১/৫৫৬) আবুল 'আলিয়া (রহঃ) বানী ইসরাঈলদের মধ্য হতেই বিভিন্ন রাসূল প্রেরণ, তাদের জন্য ধর্মীয় গ্রন্থ অবতরণ ও রাজ্য শাসনের কথাও উল্লেখ করেছেন। (তাফসীর তাবারী ১/৫৫৬) আবুল 'আলিয়া (রহঃ) আরো বলেনঃ মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বলার অর্থ হচ্ছে তাদের মাঝে নবী ও রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রেরণ করা এবং কুর'আন অবতরণ করা। এ ব্যাপারে মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে যেমনটি বলেছিলেনঃ

﴿يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا١ۖۗ وَّ اٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ﴾

হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর নি'য়ামতকে স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবী সৃষ্টি করলেন, রাজ্যাধিপতি করলেন এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন যা বিশ্ববাসীদের কাউকেও দান করেননি। (৫ নং সূরাহ্ মায়িদাহ, আয়াত নং ২০)

মহান আল্লাহর সাথে বানী ইসরাঈলের ওয়া'দার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِیْۤ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾'আমার অঙ্গীকার পুরা করো' অর্থাৎ তোমাদের কাছে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, যখন মুহাম্মাদ আগমন করবেন এবং তাঁর ওপর আমার কিতাব অবতীর্ণ হবে তখন তোমরা তাঁর ওপর ও কিতাবের ওপর ঈমান আনবে। তিনি তোমাদের বোঝা হালকা করবেন, তোমাদের শৃংখল ভেঙ্গে দিবেন এবং গলাবদ্ধ দূরে নিক্ষেপ করবেন। অর্থাৎ তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়া'দার কথা স্মরণ করো যে, তোমাদের কাছে যখন আমার রাসূল আগমন করবে তখন তাঁকে মান্য করবে এবং আমিও তোমাদেরকে তা প্রদান করবো যার প্রতিশ্র"তি আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। তোমাদের কারণে তোমাদের প্রতি যে 'আযাব আপতিত হয়েছে আমি তা দূর করে দিবো। (তাফসীর তাবারী ১/৫৫৫, ৫৫৭) হাসান বাসরী (রহঃ) আরো বলেনঃ মহান আল্লাহর সাথে বানী ইসরাঈলদের যে চুক্তির কথা বলা হয়েছে তা নিম্নের আয়াত থেকে জানা যায়। (তাফসীর তাবারী ১/১০৯)

﴿وَ لَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ ۚ۬ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیْبًا ؕ وَ قَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مَعَكُمْ ؕ لَىِٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَیْتُمُ الزَّكٰوةَ وَ اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِیْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّاٰتِكُمْ وَ لَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِیْلِ﴾

আর মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, আমি তাদের মধ্য হতে বারো জন দলপতি নিযুক্ত করেছিলাম এবং বলেছিলেনঃ আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, যদি তোমরা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করো ও যাকাত দিতে থাকো এবং আমার রাসূলদের ওপর ঈমান আনো ও তাদেরকে সাহায্য করো এবং মহান আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্য দিতে থাকো; তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপগুলো তোমাদের থেকে মুছে দিবো এবং অবশ্যই তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করো যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে অতঃপর যে ব্যক্তি এরপরও কুফরী করবে, নিশ্চয়ই সে সোজা পথ থেকে দূরে সরে পড়লো। (৫ নং সূরাহ্ মায়িদাহ, আয়াত নং ১২)

ইমাম রাযী (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বড় বড় নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছেন। এও বর্ণিত আছে যে, বান্দার অঙ্গীকারের অর্থ হচ্ছে ইসলামকে মান্য করা এবং তার ওপর 'আমল করা। (তাফসীর তাবারী ১/৫৫৮) আর মহান আল্লাহর অঙ্গীকার পুরা করার অর্থ হচ্ছে, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে জান্নাত দান করা। 'আমাকেই ভয় করো' এর অর্থ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে বলছেন যে, তাঁর বান্দাদের তাঁকে ভয় করা উচিত। কেননা যদি তারা তাঁকে ভয় না করে তাহলে তাদের ওপরও এমন শাস্তি এসে পড়বে যে শাস্তি তাদের পূর্ববর্তীদের উপর এসেছিলো। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/১৪৪)

বর্ণনা রীতি কি চমৎকার যে, উৎসাহ প্রদানের পরই ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শন একত্রিত করে সত্য গ্রহণ ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশ অনুসরণের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। কুর'আন মাজীদ হতে উপদেশ গ্রহণ করতে, তাতে বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করতে এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এ জন্যই এর পরেই মহান আল্লাহ তাদেরকে বলছেন যে, তারা যেন সেই কুর'আনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে যা তাদের নিজস্ব কিতাবেরও সত্যতা স্বীকার করে। এটা এনেছেন এমন নবী যিনি নিরক্ষর 'আরবী, সুসংবাদ প্রদানকারী, ভয় প্রদর্শনকারী, আলোকময় প্রদীপ সাদৃশ্য, যাঁর নাম মুহাম্মাদ, যিনি তাওরাত ও ইনজীলকে সত্য প্রতিপন্নকারী এবং যিনি সত্যের বিস্তার সাধনকারী। তাওরাত ও ইনজীলেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বর্ণনা ছিলো বলে তাঁর আগমনই ছিলো তাওরাত ও ইনজীলের সত্যতার প্রমাণ। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/১৪৫) আর এ জন্যই তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তিনি তাদের কিতাবের সত্যতার প্রমাণরূপে আগমন করেছেন। সুতরাং তাদের অবগতি সত্বেও যেন তারা তাঁকে প্রথম অস্বীকার না করে বসে। কেউ কেউ বলেন যে, بِهِ-এর সর্বনামটি কুর'আনের দিকে ফিরেছে। কেননা পূর্বে بِمَا أَنْزَلْتُ এসেছে। প্রকৃতপক্ষে দু'টি মতই সঠিক। কেননা কুর'আনকে মান্য করার অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মান্য করা এবং রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সত্যতা স্বীকার করে নেয়া। أَوَّلَ كَافِرٍ-এর ভাবার্থ হচ্ছে বানী ইসরাঈলের প্রথম কাফির। কারণ কুরাইশ বংশীয় কাফিররাও তো কুফরী ও অস্বীকার করেছিলো। কিন্তু বানী ইসরাঈলদের কুফরী ছিলো আহলে কিতাবের প্রথম দলের কুফরী। এ জন্যই তাদেরকে প্রথম কাফির বলা হয়েছে। তাদের সেই অবগতি ছিলো যা অন্যদের ছিলো না। 'আমার আয়াতসমূহের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করো না। এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, বানী ইসরাঈল যেন মহান আল্লাহর আয়াতসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সত্যতা স্বীকার ত্যাগ না করে। এর বিনিময়ে যদি সারা দুনিয়াও তারা পেয়ে যায় তথাপি আখিরাতের তুলনায় এটা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আর এটা স্বয়ং তাদের কিতাবেও বিদ্যমান রয়েছে।

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 'যে বিদ্যা দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি কেউ দুনিয়া লাভের উদ্দেশে শিক্ষা করে তাহলে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত পাবে না।' (সুনান আবূ দাঊদ) নির্ধারণ না করে ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার মজুরী নেয়া বৈধ। শিক্ষক যেন স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারেন এবং স্বীয় প্রয়োজনাদি পুরা করতে পারেন সেজন্য বায়তুল মাল হতে গ্রহণ করাও তাঁর জন্য বৈধ। যদি বায়তুল মাল হতে কিছুই পাওয়া না যায় এবং বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার কারণে শিক্ষক অন্য কাজ করারও সুযোগ না পান তাহলে তার জন্য বেতন নির্ধারণ করাও বৈধ। ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং অধিকাংশ 'উলামার এটাই অভিমত।

সহীহুল বুখারীর ঐ হাদীসটিও এর দালীল যা আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নির্ধারণ করে মজুরী নিয়েছেন এবং একটি সাপে কাটা রোগীর ওপর কুর'আন পড়ে ফুঁক দিয়েছেন। এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বলেনঃ 'যার ওপরে তোমরা বিনিময় গ্রহণ করে থাকো তার সবচেয়ে বেশি হকদার হচ্ছে মহান আল্লাহর কিতাব।'

শুধুমাত্র মহান আল্লাহকেই ভয় করার অর্থ এই যে, মহান আল্লাহর রহমতের আশায় তাঁর ‘ইবাদত ও আনুগত্যে অটুট থাকতে হবে এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে তাঁর অবাধ্যতা ত্যাগ করতে হবে। এই দু’ অবস্থায়ই স্বীয় রবের পক্ষ হতে সে একটি জ্যোতির ওপর থাকে। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/১৪৭) মোট কথা তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, তারা যেন দুনিয়ার লোভে তাদের কিতাবে উল্লিখিত নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাবুওয়াতের সত্যতা গোপন না করে এবং দুনিয়ার শাসন ক্ষমতার মোহে পড়ে বিরুদ্ধাচরণ না করে, বরং রাব্বকে ভয় করে সত্যকে প্রকাশ করতে থাকে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৪১

وَ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَ لَا تَكُوْنُوْۤا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ ۪ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّ اِيَّایَ فَاتَّقُوْنِ

আর আমি যে কিতাব পাঠিয়েছি তার ওপর ঈমান আন। তোমাদের কাছে আগে থেকেই যে কিতাব ছিল এটি তার সত্যতা সমর্থনকারী। কাজেই সবার আগে তোমরাই এর অস্বীকারকারী হয়ো না। সামান্য দামে আমার আয়াত বিক্রি করো না। আমার গযব থেকে আত্মরক্ষা করো।

৪১ নং আয়াতের তাফসীর:

তোমরা আমাকে ভয় কর! অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আরো বিশেষভাবে এমন নির্দেশ দিচ্ছেন যা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হবে না এবং সঠিক হবে না, তা হল “আমি যা অবতীর্ণ করেছি তোমরা তার প্রতি ঈমান আন” অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনুল কারীমের প্রতি ঈমান আন।

(مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ)

‘তোমাদের সাথে যা আছে তা তাঁরই সত্যতা প্রমাণকারী’অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ কুরআন তোমাদের নিকট যা রয়েছে তার সমর্থনকারী, তার পরিপন্থী নয়।

অতএব যেহেতু কুরআন তোমাদের নিকট যা কিছু রয়েছে তার সমর্থনকারী তাহলে তার প্রতি ঈমান আনায় তোমাদের কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাই নিয়ে এসেছেন যা অন্যান্য নাবী-রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন। অতএব তোমরাই তার প্রতি ঈমান আনার অধিক হকদার। কারণ তোমরা হলে কিতাবপ্রাপ্ত। আর যদি তোমরা তার প্রতি ঈমান না আন, তাহলে তোমাদের নিকট যা আছে তা মিথ্যা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা তিনি যা নিয়ে এসেছেন অন্যান্য নাবীরাও তা-ই নিয়ে এসেছেন। অতএব তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অর্থ হল তোমাদের নিকট যা আছে তাকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

(وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ)

'এতে তোমরাই প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না'এ আয়াতের তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা তাঁর প্রতি প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। কারণ তোমাদের নিকট এমন জ্ঞান আছে যা অন্যদের নিকট নেই।

আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তোমরা প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। এরূপ বলেছেন হাসান বসরী, সুদ্দী, রাবী বিন আনাস।

ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন: আমার কাছে গ্রহণযোগ্য কথা হল, তোমরা কুরআনের প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, ১৯৯)

আহলে কিতাবদেরকে এ কথা বলার কারণ হল, তাদেরকে আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে মুহাম্মাদ ও কুরআনের ব্যাপারে জ্ঞান ছিল, তাই তারাই যদি প্রথম অস্বীকারকারী হয় তাহলে যাদের কিতাব দেয়া হয়নি তারা কখনোই ঈমান আনবে না।

(وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا)

'আর আমার আয়াতসমূহের পরিবর্তে সামান্য মূল্য গ্রহণ কর না'এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম সুদ্দী বলেন: এর ভাবার্থ হল, আল্লাহ তা'আলার আয়াতের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করা।

বিশিষ্ট তাবেয়ী রাবী বিন আনাস এবং আবুল আলিয়া বলেন: আল্লাহ তা'আলার আয়াতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ কর না।

সঠিক কথা হল বানী ইসরাঈলরা যেন আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলের সত্যতার স্বীকার পরিত্যাগ না করে। যদিও এর বিনিময়ে সারা দুনিয়াও তারা পেয়ে যায়। আখিরাতের তুলনায় তা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। স্বয়ং এটা তাদের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَي بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে বিদ্যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় তা যদি কেউ দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে তবে সে কিয়ামাতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। (আবূ দাঊদ হা: ৩৬৬৪, ইবনু মাজাহ হা: ২৫২ সহীহ)

এর অর্থ এমন নয় যে, কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ নয়। বরং শিক্ষা গ্রহণ করবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তবে তা শিক্ষা দিয়ে বিনিময় নিতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নির্ধারিত মজুরী নিয়ে একটি সাপে কাটা রোগীকে কুরআন দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করেছেন। এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলার কিতাবের মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করা সবচেয়ে বেশি হকদার। (সহীহ বুখারী হা: ৫৪০৫, ৫৭৩৭)

অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মহিলা সাহাবীর সাথে অপর সাহাবীকে বিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে বলেছেন: তোমার সাথে এই নারীর বিয়ে দিলাম এ মোহরের বিনিময়ে যে, তোমার যতটুকু কুরআন মাজীদ মুখস্ত আছে তা তুমি তাকে মুখস্ত করিয়ে দেবে।

অতএব ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষার পিছনে সময় ব্যয়ের বিনিময় নেয়া বৈধ। শিক্ষক যেন সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারে এবং স্বীয় প্রয়োজনাদি পূরণ করতে পারে এজন্য বায়তুল মাল হতে গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ। যদি বায়তুল মাল হতে কিছুই পাওয়া না যায় এবং বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার কারণে অন্য কাজ করার সুযোগ না পান তবে তার জন্য বেতন নির্ধারণ করাও বৈধ।

'সামান্য দাম' বলে দুনিয়ার স্বার্থ ও লাভের কথা বুঝানো হয়েছে। এর বিনিময়ে মানুষ আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করছিল। সত্যকে বিক্রি করে তার বিনিময়ে সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ হাসিল করলেও তা আসলে সামান্য দামই গণ্য হবে। কারণ সত্য নিঃসন্দেহে তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৪২

وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

মিথ্যার রঙে রাঙিয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করো না এবং জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করো না।

৪২ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] কাতাদাহ ও হাসান বলেন, 'হককে বাতিলের সাথে মিশ্রণ ঘটিয়ো না' এর অর্থ ইয়াহুদীবাদ ও নাসারাবাদকে ইসলামের সাথে এক করে দেখবে না। কেননা, আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে, ইসলাম। আর ইয়াহুদীবাদ ও নাসারাবাদ (খৃষ্টবাদ) হচ্ছে বিদ'আত বা নব উদ্ভাবিত বিষয়। সেটি কখনো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। সুতরাং এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন ধর্মকে একাকার করে এক ধর্মে পরিণত করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আবুল আলীয়াহ বলেন, এর অর্থ তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বান্দাদের কাছে নসীহত পূর্ণ কর। অর্থাৎ তোমাদের কিতাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা আল্লাহ্‌র বান্দাদের কাছে বর্ণনা কর। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

আল্লামা শানকীতী বলেন, তারা যে হককে বাতিলের সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে তা হচ্ছে, তারা তাওরাতের কিছু অংশের উপর ঈমান এনেছে। আর যে বাতিলকে হকের সাথে মিশিয়েছে তা হচ্ছে, তারা তাওরাতের কিছু অংশের সাথে কুফরী করেছে এবং তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যেমন, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে সমস্ত গুণাগুণসহ অনুরূপ যা কিছু তারা গোপন করেছে এবং মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। এর বর্ণনায় পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছুর উপর ঈমান আন, আর কিছুর সাথে কুফরী কর" [সূরা আল-বাকারাহ: ৮৫]

এ আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা এবং সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

[২] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ, তোমরা আমার রাসূল মুহাম্মাদ এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা সম্পর্কে যে জ্ঞান তোমাদের নিকট আছে তা গোপন কর না। অথচ তার সম্পর্কে তোমরা

তোমাদের কাছে যে গ্রন্থ আছে তাতে নিশ্চিতভাবেই অনেক কিছু পাচ্ছ। আত-তাফসীরুস সহীহ মুজাহিদ বলেন, আহলে কিতাবগণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোপন করে থাকে। অথচ তারা তার ব্যাপারে তাওরাত ও ইঞ্জীলে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পেয়ে থাকে। [তাবারী] এ আয়াত থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম।

এ আয়াতটির অর্থ বুঝার জন্য সমকালীন আরবের শিক্ষাগত অবস্থাটা সামনে থাকা দরকার। আরববাসীরা সাধারণভাবে ছিল অশিক্ষিত। তাদের তুলনায় ইহুদিদের মধ্যে এমনিতেই শিক্ষার চর্চা ছিল অনেক বেশী। তাছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইহুদিদের মধ্যে এমন অনেক বড় বড় আলেম ছিলেন যাদের খ্যাতি আরবের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্ব পর্যায়েও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই আরবদের ওপর ইহুদিদের ‘জ্ঞানগত’ প্রতিপত্তি ছিল অনেক বেশী। এর ওপর ছিল আবার তাদের উলামা ও মাশায়েখের ধর্মীয় দরবারের বাহ্যিক শান –শওকত। এসব জাঁকালো দরবারে বসে তারা ঝাঁড়-ফুঁক, দোয়া-তাবিজ ইত্যাদির কারবার চালিয়েও জনগণের ওপর নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি গভীরতর ও ব্যাপকতর করেছিলেন। বিশেষ করে মদীনাবাসীদের ওপর তাদের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। কারণ তাদের আশেপাশে ছিল বড় বড় ইহুদি গোত্রের আবাস। ইহুদিদের সাথে তাদের রাত-দিন ওঠাবসা ও মেলামেশা চলতো। একটি অশিক্ষিত জনবসতি যেমন তার চাইতে বেশ শিক্ষিত, বেশী সংস্কৃতিবান ও বেশী সুস্পষ্ট ধর্মীয় গুণাবলীর অধিকারী প্রতিবেশীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, এই মেলামেশায় মদীনাবাসীরাও ঠিক তেমনি ইহুদিদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

এ অবস্থায় নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজেকে নবী হিসেবে পেশ করলেন এবং লোকদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে থাকলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই অশিক্ষিত আরবরা আহলে কিতাব ইহুদিদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো, “আপনারাও তো একজন নবীর অনুসারী এবং একটি আসমানী কিতাব মেনে চলেন, আপনারাই বলুন, আমাদের মধ্যে এই যে ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করছেন তাঁর এবং তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি?” মক্কার লোকেরাও ইতিপূর্বে ইহুদিদের কাছে এ প্রশ্নটি বার বার করেছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর এখানেও বহু লোক ইহুদি আলেমদের কাছে গিয়ে একথা জিজ্ঞেস করতো। কিন্তু ইহুদি আলেমরা কখনো এর জবাবে সত্য কথা বলেনি। ডাহা মিথ্যা কথা বলা তাদের জন্য কঠিন ছিল। যেমন, মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাওহীদ পেশ করছেন তা মিথ্যা। অথবা আম্বিয়া, আসমানী গ্রন্থসমূহ, ফেরেশতা ও আখেরাত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সঠিক নয়। অথবা তিনি যে নৈতিক মূলনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন তার মধ্যে কোন গলদ রয়ে গেছে। তবে যা কিছু তিনি পেশ করছেন তা সঠিক ও নির্ভুল—এ ধরনের স্পষ্ট ভাষায় সত্যের স্বীকৃতি দিতেও তারা প্রস্তুত ছিল না, তারা প্রকাশ্যে সত্যের প্রতিবাদ করতে পারছিল না আবার সোজাসুজি তাকে সত্য বলে মেনে নিতেও প্রস্তুত ছিল না। এ দু’টি পথের মাঝখানে তারা তৃতীয় একটি পথ অবলম্বন করলো। প্রত্যেক প্রশ্নকারীর মনে তারা নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর জামায়াত ও তাঁর মিশনের বিরুদ্ধে কোন না কোন অসঅসা-প্ররোচনা দিয়ে দিত। তাঁর বিরুদ্ধে কোন না কোন অভিযোগ আনতো, এমন কোন ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলতো যার ফলে লোকেরা সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে পড়ে যেতো। এভাবে তারা মানুষের মনে সন্দেহ ও সংশয়ের বীজ বপন করে তাদেরকে বেড়াজালে আটকে রাখতে এবং তাদের মাধ্যমে নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদেরকেও আটকাতে চাইতো। তাদের এ দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতির কারণে তাদেরকে বলা হচ্ছেঃ সত্যের গায়ে মিথ্যার

আবরণ চড়িয়ে দিয়ো না। নিজেদের মিথ্যা প্রচারণা এবং শয়তানী সন্দেহ-সংশয় আপত্তির সাহায্য সত্যকে দাবিয়ে ও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করো না। সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে দুনিয়াবাসীকে প্রতারিত করো না।

সত্যকে আড়াল করা কিংবা সত্যকে পরিবর্তন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

ইয়াহূদীদেরকে এ বদ অভ্যাসের জন্য তিরস্কার করা হচ্ছে যে, তারা জানা সত্ত্বেও কখনো সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত করতো, আবার কখনো সত্যকে গোপন এবং মিথ্যাকে প্রকাশ করতো। তাদরেকে এ বদঅভ্যাস ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে এবং উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন সত্যকে প্রকাশ করে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। আর তারা যেন ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত না করে, মহান আল্লাহর বান্দাদের মঙ্গল কামনা করে, ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের বিদ'আতকে ইসলামের শিক্ষার সাথে মিশ্রিত না করে। (তাফসীর তাবারী ১/৫৬৯) আর জানা তাদের কিতাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী পাচ্ছে তা যেন সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করতে কার্পণ্য না করে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৪৩

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে অবনত হচ্ছে তাদের সাথে তোমরাও অবনত হও।

৪৩ নং আয়াতের তাফসীর:

হাসান বলেন, সালাত এমন এক ফরয যা না পাওয়া গেলে অন্য কোন আমলই কবুল করা হয় না। অনুরূপভাবে যাকাতও। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আয়াতে বর্ণিত রুকূ' এর শাব্দিক অর্থ ঝুঁকা বা প্রণত হওয়া। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সিজদার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। কেননা, সেটাও ঝুঁকারই সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরীআতের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝুঁকাকে রুকূ' বলা হয়, যা সালাতের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। আয়াতের অর্থ এই যে, রুকূ'কারীগণের সাথে রুকূ কর। এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, সালাতের সমগ্র অংগ-

প্রত্যংগের মধ্যে রুকূ'কে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো? উত্তর এই যে, এখানে সালাতের একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, কুরআনুল কারীমের এক জায়গায় (وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ) 'ফজর সালাতের কুরআন পাঠ' বলে সম্পূর্ণ ফজরের সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের কোন কোন রেওয়াতে 'সিজদা' শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাকাআত বা গোটা সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, সালাত আদায়কারীগণের সাথে সালাত আদায় কর। অর্থাৎ "রুকূ'কারীদের সাথে শব্দদ্বয়ের দ্বারা জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

নামায ও যাকাত প্রতি যুগে দ্বীন ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। অন্যান্য সব নবীদের মতো বনী ইসরাঈলদের নবীরাও এর প্রতি কঠোর তাগিদ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইহুদিরা এ ব্যাপারে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাদের সমাজে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থাপনা প্রায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বেশীর ভাগ লোক ব্যক্তিগত পর্যায়েও নামায ছেড়ে দিয়েছিল। আর যাকাত দেয়ার পরিবর্তে তারা সুদ খেতো।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সালাত কায়িম ও যাকাত প্রদান ও রুকুকারীদের সাথে রুকু করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

(وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ)

"এবং রুকুকারীদের সাথে রুকূ কর"আয়াতের এ অংশ প্রমাণ করছে সালাত আদায় করতে হবে জামাতের সাথে।

এ ব্যাপারে হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুব তাগিদ দিয়ে বলেন: আমার ইচ্ছা হয় কতক যুবকদের নির্দেশ দিই তারা কিছু কাঠ একত্রিত করুক, তারপর ঐ সকল ব্যক্তিদের বাড়িতে যাই যারা বিনা কারণে বাড়িতে সালাত আদায় করেছে, তাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেই। (সহীহ বুখারী হা: ৬৪৪, সহীহ মুসলিম হা: ৬৫১.)

এ কঠিন নির্দেশমূলক কথা হতে প্রমাণিত হয় যে, সুস্থ পুরুষদের জামাতে সালাত আদায় করা অপরিহার্য বিষয়।

বিশিষ্ট তাবেয়ী মুকাতিল (রহঃ) বলছেন, এ কথার অর্থ হল: আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে, রাসূলের সাথে সালাত আদায়, রাসূলের কাছে যাকাত প্রদান ও উম্মাতে মুহাম্মাদীর সাথে রুকু করার নির্দেশ প্রদান করছেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের শুকরীয়া করা ওয়াজিব।

২. ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব, বিশেষ করে বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে যে সব ওয়াদা হয়েছে।

৩. সত্য বিষয় বর্ণনা করা ওয়াজিব এবং তা গোপন করা হারাম।

৪. জ্ঞানার্জন করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

৫. কুরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ, তবে তা যেন মূল লক্ষ্য না হয়।

৬. হকের সাথে বাতিল মিশ্রণ করা হারাম।